অবসরে সাহিত্য চর্চা, দূর হবে বিষন্নতা

বর্ণালী

অক্টোবর সংখ্যা, ২০২০

প্রকাশনায়ঃ ভূতত্ত্ব সাহিত্য সংঘ

বর্ণালী

অক্টোবর, ২০২০

অবসরে সাহিত্য চর্চা, দূর হবে বিষন্নতা

সম্পাদনায়

লিটন আকন্দ

মোঃ রাসেল সরকার

মোঃ সাব্বির হাসান

মোঃ তসলিম উদ্দীন

মোঃ রাফিকুজ্জামান রাফিক

মুকীত আজমাইন শাহরিয়ার

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ

নারী/ দীপা রায়

কবিতা

প্রতীক্ষা/ লিটন আকন্দ

জ্যেষ্ঠ/ লিটন আকন্দ

তুমি শুধু তুমি/ প্রিয়াংকা গাঙ্গুলী

আত্মবলিদান/ বিজয় পাল

নারী/ মোঃ রফিকুজ্জামান রফিক

বিয়ে/ ফাতেমা মোস্তারিন

নারীর সম্মান/ মো: সাব্বির হাসান

গল্প

গোধূলি সন্ধ্যা/ দীপা রায়

এক পলকে অভিশপ্ত/ ফ্লোরা পারভীন তামান্না

নিয়তি/ সজীব ঘটক

নিভু প্রদীপ/ রাইহান

সম্পাদকীয়

ভূতত্ত্ব সাহিত্য সংঘ থেকে প্রকাশিত মাসিক ম্যাগাজিন 'বর্ণালী'র তৃতীয় অনলাইন সংস্করণটি আজ প্রকাশিত হলো।

বই পড়ার অভ্যাস নেই আর পড়তে জানেনা এমন লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মার্ক টোয়েইনের এই কথা থেকেই বুঝা যায় বই পড়ার গুরুত্ব কতটুকু। বর্তমানে লেখক ও পাঠকের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য ম্যাগাজিনটি আপনাদের দিচ্ছে সাহিত্য চর্চার বিশাল সুযোগ। বর্তমানে দেশের একাধিক ধর্ষণের ঘটনায় লেখকদের প্রতিবাদ, জীবনের গল্প, করোনা পরিস্থিতি, লেখকের চিন্তাচেতনা ও প্রকৃতি ভাবনা নিয়ে থাকছে আমাদের এবারের আয়োজন। ম্যাগাজিনটি প্রকাশে যারা অবদান রেখেছেন তাদের কাছে আমরা 'টিম বর্ণালী' আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ধন্যবাদ।-

-টিম বর্ণালী

প্রবন্ধ

নারী

"ন" থেকে নারী আবার "ন" তে না। বলা হয়ে থাকে 'না' এর চেয়ে নারীর শক্তি বেশি। এটা আমার কাছে একটা হাস্যকর এর মতো। যদি 'না' এর থেকে নারী এর শক্তি বেশি হতো তাহলে তারা এই 'না' শব্দটার প্রভাব তাদের জীবনে মেনে নিতো না। একটা মেয়ে শিশুকে কিন্তু প্রথম 'না' শব্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় তাদের মা নিজেই। বলা হয়ে থাকে তুমি মেয়ে তোমার এটা করা যাবে না, ওখান এ যাওয়া যাবে না ইত্যাদি। সেখানে মায়ের দোষ নেই, কারন সেই মা টাও কিন্তু ছোট বেলা থেকে এসব শুনে আসতেছে আর নিজেদের জীবনেও এর প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। নেপোলিয়ান বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের শিক্ষিত জাতি দিব"। আচ্ছা উনি কোন শিক্ষার কথা বলেছিলেন? পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করে দুই-চারটা নামের শুরুতে ডিগ্রি, না সুশিক্ষা? সবাই নেপালিয়ান এর উক্তিটাকে বিকৃত করেছে। বর্তমান সমাজে মেয়েদের কে বড় বড় ডিগ্রি এর জন্য পড়াশোনা করানো হয়। সুশিক্ষার জন্য নয়।

একটা মেয়ে শিশু পরিবার এ জন্মানোর পরপরই তার মাথায় একটা শব্দ ভালো করে গেথে দেওয়া হয় তুমি মেয়ে, তুমি চাইলেও সব কিছু করতে পারবে না। মেয়ে শিশুটা যখন ছোট থাকে তখন বাবা-মায়েরা একা কোথাও বের হতে দেয় না। বলে তুমি ছোট বাইরে গেলে কেউ আঘাত করতে পারে, যখন বড় হয় মেয়েটা তখনও তাকে বাইরে যেতে দেওয়া হয় না তাদের ইচ্ছেমতো, তাদের বলা হয়ে থাকে এতোবড় মেয়ে বাইরে এভাবে চলাফেরা করলে মানুষ খারাপ কথা শোনাবে। আর যখন বিয়ে হয় তখনতো মেয়েদের অঘোষিত শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। কারন বিয়ের পর কোথাও যেতে গেলে পতিদেবতার আদেশ নিতে হয়, আবার সেই পতিদেবতা নামক প্রানীটা আদেশ দিলেও তার বাবা-মা যেকোনো একজন ভেটো দিবেই। আর বলবে ভাল বাড়ির বউরা এভাবে চলাফেরা করে না। তাহলে মেয়েরা তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা কবে পাবে? আর এসব এর জন্য কি তারা নিজেরা দায়ী নয় কী? বিভিন্ন খবরের কাগজ, টেলিভিশন সব জায়গায় দেখা যায় নারীর অধিকার নিয়ে আন্দোলন করতেছে, সরকরের কাছে নারীর অধিকার দাবী করতেছে। এসব করে

সরকারের কাছে থেকে শুধু নারীর অধিকার আদায় করা হচ্ছে কাগজে কলমে। আদোও কি নারীরা নিজেদের অধিকার আদায়ে এতোটা উৎসাহী? তাদের আশেপাশেই তো কতোভাবে এমনকি তাদের পরিবারই তো তাদের অধিকার খর্ব করে তারা কি সেগুলো কখনো আদায় করতে চেয়েছে? না তাদের সাথে প্রতিনিয়ত হওয়া অন্যায় এর প্রতিবাদ করছে?

জন্মের পর একটা ছেলে সন্তানকে এই বলে উৎসাহ দেওয়া হয় যে, তুমি ভালো করে পড়াশোনা কর, তোমাকে সংসার এর দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু একটা মেয়েকে এটা বলা হয়, ভালো করে পড়াশোনা কর, একটা ভালো জামাই পাবে। বর্তমান সমাজের সব জায়গায় বলা হয়ে থাকে ছেলে মেয়ের সমান অধিকার। এটার প্রতিফলনটা কোথায়? একটা মেয়ে সন্তানকে এটা কেনো বলা হয় না, ভাল করে পড়াশোনা করে স্বামীর উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজে যেনো সংসার এর হাল ধরতে পার। আর মেয়েরাও বাবা-মায়ের এই কথাটাকে বেদবাক্য মনে করে। তারা এটা বুঝে না যে, কেউ কাউকে সেচ্ছায় কোন অধিকার দেয় না,

সেটাকে অর্জন করে নিতে হয়।
হুমায়ূন আহামেদ বলেছেন, "অসংখ্য কষ্ট, যন্ত্রণা পেয়েও মেয়েরা মায়ারটানে একটা ভালবাসা, একটা সম্পর্ক, একটা সংসার টিকিয়ে রাখতে চায়।" এটা ঠিক যে মেয়েরা সংসারে যতো বেশি সমর্পিত হবে সেই সংসার এ ততবেশি সুখ ও শান্তি বিরাজ করবে। তাই বলে নিজের সাথে হওয়া অন্যায় গুলোও মেনে নিবে আর পরর্বতীতে নিজের মেয়েকেও একই মন্ত্রের বীজ বুনবে।

আমাদের সমাজে যারা কম কথা বলে, যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, তাদেরকে অনেক ভদ্র আর ভাল মানুষ এর উপাধি দেওয়া হয়। নারীরা যদি একদিন তাদের সাথে হওয়া অন্যায় এর প্রতিবাদ করে আর নিজেদের অধিকার আদায়ে নিজেরা সোচ্চার হয়, তাহলে আমাদের এই মূর্খ সমাজ এ তাদের সাহসিকতার নামে গুনগান গাবে। কিন্তু মেয়েরা তা কখনো করবে না। বর্তমানে খবর এর কাগজে চোখ বুলালে পাওয়া যায় কোন না কোন জায়গায় ধর্ষণ, যৌতুকের জন্য মারপিট থেকে হত্যা করার মতো জঘন্য কাজ। মেয়েরা নিজেরা চাইলেই এসব রোধ করতে পারে। ওই যে

বললাম আমাদের সমাজ ব্যবস্হা নেপোলিয়ান এর উক্তির উল্টো প্রয়োগ করছে। মেয়েদের স্বশিক্ষার

অভাব। তারা যদি পড়াশোনার বাইরে নিজেদের আর্ত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন কলাকৌশল আয়ত্ত করতো, তাহলে তারা নিজের রক্ষা নিজেরই করতে পারতো। ধর্ষণের বিচার এর জন্য আদালত এর দরজায় আসা লাগত না, তাদের সাথে এরকম হওয়ার আগেই ওই নরপিশাচদের নিজেরাই শাস্তি দিতে পারত। প্রতিনিয়ত মেয়েরা যৌন হয়রানির স্বীকার হয়। তারা চাইলেই তৎক্ষণাৎ যে লোকটা এসব করার চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের সবার সামনে নিয়ে আসতে পারে। তার জন্য দরকার শুধু একটু প্রতিবাদী মানসিকতা আর আত্মমর্যাদাপূণ্য একজন নারীর। কিন্তু নারীরা এসব করতে পারে না। কারন একটাই জন্মের পরপরই তাদের মা তাদের 'না' শব্দটা ভাল করে মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করায়। তারা অনেক কিছু করতে চাইলেও তাদের মস্তিস্ক তাদের তা করতে বাধা প্রদান করে।

সমাজ নারীদের অনেক উচু আসনে বসিয়েছে, অনেক সম্মান দিয়েছে তার সাক্ষী ইতিহাস। আর

সেইসব সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মাকড়শার জালের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা সমস্যাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে হবে। তাহলেই নেপোলিয়ান এর উক্তির যর্থার্থ সার্থকতা থাকবে।

দীপা রায়

২০১৮-২০১৯ সেশন,

ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্সেস বিভাগ,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কবিতা

প্রতীক্ষা

আজ কতদিন হয়ে গেল
ঘর আর উঠোন
এর বাইরে যেতে মানা দুরন্ত ছোট্ট শিশুটির।
যদিও আবদার করে মায়ের কাছে
হাঁটতে যাবে বাইরে
মা বলে আর কয়েকদিন আমরা সবাই যাব।
ও চুপ করে থাকে, এটা অপেক্ষা কী না
ও বুঝতে পারে না।
তবে একই কথা শুনেই যাচ্ছে অনেক দিন।
নীরব বসে থাকে বাবা
এতবেশি বেশি সময় বাড়িতে থাকেন যে
এখন আর তার প্রত্যাবর্তনে
কেউ দৌড়ে এসে কোলে উঠে না
কিংবা কেউ বলে না
"কিগো, আজ এত দেরি হলো যে",
মা মনে হয় ভুলেই গেছে
তার নিত্যকার বুলিগুলি
"খোকা, টিউশন শেষ? বাসায় যা,
বাইরে দেরি করিস না বাবা

যুগ জামানা ভালো না"
কিংবা" এই যে আসছে জমিদারের বাচ্চা,
এই বুঝি তোর ফেরার সময় হলো?"
অনেক দিন হলো মুবিন বাড়ি এসে বলে না
"মা, আজ টিফিনের সময় ছুটি হয়েছে
কিংবা সে তার সদ্য লাল হয়ে যাওয়া হাতে
লুকিয়ে রাখে না, যেখানে স্যারের মার পড়েছিল।
কবে স্কুলে যাবে ও?

দাদু আর মসজিদে দেরি করে না
দাদুর সাথে গ্রামের দাদুরা তালিমে বসে না
অনেক দিন।

কতদিন হলের ডাইনিং এ লাউভ দেখা হয় না
স্প্যানিশ, ইউরোপিয়ান বা এল ক্লাসিকো
কিংবা টেস্ট ওয়ানডে টিটোয়েন্টি।
ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে হাত দোলানো হয় না
শিরোনামহীন চিরকুট কিংবা অর্থহীন আর্টসেল
ওয়ারফেজের সাথে।
কতদিন তাদের হাঁটা হয় নি পাশা পাশি
রাস্তার দিকে নিজে থেকে তাকে আগলে।
কিংবা কত্তদিন খোঁপায় গুঁজে দেয় নি ফুল,

কতদিন সে ব্যাগে আনে নি
নিজ হাতে রান্না করা খাবার
খাওয়ায় নি নিজ হাতে!
কতদিন ব্যাগ গুছানো হয় না দুই রাত তিন দিনের জন্যে।
কতদিন আর বলা হয় না
সামনের মাসের ২ তারিখ বাড়ি আসছি...
কবে শেষ হবে এই প্রতীক্ষার?
অপেক্ষায় আছি,
একদিন এই প্রতীক্ষা শেষ হবেই....

মোঃ লিটন আকন্দ
ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

জ্যেষ্ঠ

কালবৈশাখী বাড়ির বায়ুকোণে
বুকপেতে দাঁড়িয়ে থাকা নিবিড় বাঁশঝাড়।
জলমগ্ন নৌকার অদূরে প্রতীয়মাণ
দৈব জীর্ণ কলা গাছ।

মরুর অগ্নিঝড়া তপ্ত বালুময় প্রান্তরে
লম্বা খেজুর গাছের রঁজনবৈচিত্র্য।
অন্ধকার রাতে হাঁপানি রোগীর খুঁজে পাওয়া
হারানো ইনহেলার।

কাঠপোড়া রোদের দিন শেষে মাগরিবের আজান
কানে আসা মাত্র ঠান্ডা পানিতে প্রথম চুমুক।
নিষ্ঠুর শহরে ঘোর বিপদে ওয়াচ পকেট হাতড়ে
পাওয়া একশো টাকার একটা চকচকে নোট।

মেরুর কনকনে শীতে লাকড়ি জ্বালানোর জন্য
দিয়াশলাই এর শেষ কাঠিটা।
অমাবস্যার রাতে অন্ধকারে
হাতে থাকা নোকিয়া বারো'শ নয় এর ক্ষীণ টর্চ।

স্রোতের বিপরীতে সাঁতারপ্রায় পানিতে পায়ের
নিচের শক্ত মাটির ঢিবি টুকু।
হ্যা, আমি একজন বড় ভাইয়ের কথা বলছি।

মোঃ লিটন আকন্দ
ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

তুমি শুধু তুমি

হৃদয়ের ছন্দ তুমি
শিশিরের গন্ধ তুমি,
তিমিরের আলো তুমি
প্রদীপের কালো তুমি।

জোছনার কলঙ্ক তুমি
অমাবশ্যার মাধুর্য তুমি,
শুভ্র কাশবনের বেদনা তুমি
রক্তজবার রুক্ষতা তুমি।

তুলো মেঘের ছায়া তুমি
শিলাবৃষ্টির ঐকতান তুমি
দুই চোখের পাতা তুমি।

প্রথম ভুল তুমি,
পাগলামির শাস্তি তুমি,
হাজার মন্দের ভালো তুমি।

কোকিল- কণ্ঠের গান তুমি
উড়ন্ত চিলের ডানা তুমি,
ক্ষুধার্ত কাকের কান্না তুমি।

আঙুলের ইশারা তুমি,
ঠোঁটের নরম পেশি তুমি,
জীবনের রঁজন তুমি,
দু'হাতের বন্ধন তুমি।
তুমি, শুধু তুমি।

প্রিয়াংকা গাঙ্গুলী
প্রথম বর্ষ,
শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ,
গোপালগঞ্জ।

আত্মবলিদান

আমি তেরোশত নদীর প্রতিনিধি হয়ে বলছি,
জোয়ার ভাটার এই উত্থান পতনই
আমার জীবন।
শত শত দুর্গম পথ ডিঙিয়ে
ছুটে চলি আমি সাগর পানে
না মানি কোনো বাঁধা, বারণ।

আমি বিশাল সমুদ্র বলছি,
আমিও যে স্বাধীন তা কিন্তু নয়,
আমাকে পাহারা দিচ্ছে ঐ বিশাল আকাশ।
কোনো এক সীমান্তে সে আমাকে ছুঁয়েছে
সেখানেই যেন বন্দি আমি
শুধু পাহারা দিয়েই তার মিটেনি আশা।

আমি সকল পাহাড় পর্বত বলছি,
আকাশের সনে ভাব করিতে মাথা উঁচু করি।
পাষাণ বলিয়া ফিরাইয়া দেয় মোরে পাষা,
এ বেদনা আমি সহিতে না পারি নয়নে ঝরে বারি।

এ বৃক্ষের বেদনা কহিব কি আর
ফুলে ফলে ভরাইয়া তুলি এ জগৎ সংসার।
তবু কেন ভালোবাসা পাইনা সবার?
হাওয়া দিই, ছায়া দিই তবু
ডাল ভাঙে আমার।

ভরা বসন্তের কোকিল পাখি আমি
কৃষ্ণচূড়ার ঐ মগডালে বসিয়া গান শুনাই দিনভর।
মানবকুল বড্ড ভালোবাসে আমায়,
বন্দুক আর গুলতি দিয়া তারা করে সমাদর।

উদারতার প্রতীক আমি সুনীল আকাশ
বৃষ্টির লাগি এ বক্ষে মেঘ জমাই
গ্রীষ্মের প্রখরতা নিবারণে।
অঝোর ধারায় প্রকৃতি পায় নতুন প্রাণ
প্রকৃতির এই প্রাণোচ্ছলতায় আমি
সাজিয়া উঠি রংধনুর রঙে।

বিজয় পাল
প্রথম বর্ষ, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নারী

তোমার জন্মের দিন বাবা মিষ্টি বিতরণ করেনি;
সেদিন বাবার হাসি মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিল।
তোমার প্রথম পা পড়েছিল অমসৃণ পথে-
তুমি বাবার নতুন চিন্তা,
কারণ তুমি নারী-
সমাজ তোমাকে অপয়া বলবেই।

আজ,
তোমার বয়স ষোল-
এখন তুমি আকর্ষণীয়া;
রাস্তার দুষ্ট ছেলেরা তোমাকে দেখে শিশ দেয়;
তোমার ফেসবুকে কত ছেলে বার্তা পাঠায়;
আজ কত ছেলের কামনার বস্তু তুমি।
কিন্তু তুমি ফিরে তাকালেই,
সমাজ তোমার চরিত্রে সীলমোহর মারবেই।
কারন তুমি নারী-
তোমার দিকে আঙ্গুল তুলে বলবেই তুমি দুশ্চরিত্রা,
জলে যাবে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি, তোমার মেধা।

তুমি নিয়োগ পাবে পরিচায়িকা হিসেবে;
তোমার ভবিষ্যত রান্নাঘরে।
এখন তুমি মা, তোমার পুত্রের কাছে
তুমি শ্রদ্ধার পাত্র;
কিন্তু মা তুমি কি জানো তোমার ছেলে রাস্তার
ধারে কি করে?
চায়ের দোকানে আসা মেয়েদের দিকে
কোন দৃষ্টিতে তাকায়-
তুমি কি কখনো নিষেধ করেছো?
তাহলে তুমি কেমন মা!

আজ তুমি বৃদ্ধা, তোমার ছেলে-বউয়ের কাছে তুমি
অবহেলার, তোমার নাতি-নাতনি আজ তোমাকে
ডাকে 'বুড়ী' বলে।
ধিক্কার জানাই সেই সব নারীকে-
ধিক্কার জানাই সেই সব পুরুষকে।

আমরা মাকে ভালোবাসি-
ভালোবাসি বোনকে,
তাহলে কেনো আমরা ভালোবাসতে পারিনা
অন্য নারীকে??

এ আমাদের হীনমন্যতা নয় কি ?
তাহলে কবে আমরা সত্যিকারের পুরুষ হয়ে
নারীর হাতে-হাত রেখে জয় করব পৃথিবী।

মোঃ রফিকুজ্জামান রফিক
২য় বর্ষ, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বিয়ে

বয়স কেবল তখন ১১ কি ১২
বিয়ের জন্য সবাই পাগল।
স্কুলে গেছি, ফিরে দেখি ঘটক
আমার জন্য বিয়ে সমন্ধ এনেছে।

বললাম,
না, বাল্যবিবাহ করব না আমি।
এভাবেই ১৮ হওয়া পর্যন্ত অনেক লড়াই,
অবশেষে আমি ১৮।

জানেন?
যখন ১১ কি ১২ ছিলাম
তখন দোকানি, কেউ পুলিশ
কেউ বা তখন ৩০ এর পাত্র ছিল।

যখন ১৮ পার হলাম
তখন মুক্ত চেতনায় বড় হলাম।
বিয়ে নয় এখন সেই মানুষগুলোকে নিয়ে থাকি
যারা আমায় জন্ম দিয়েছে।

এভাবেই লোকের মুখ বন্ধ করলাম
কিন্তু, আজ যখন মনে হলো
বাধা পড়ার দিন বুঝি এলো
তখন নাকি আর বর নাই।

মেয়ে মোটা, কালো, চাকরি নাই
এম.এ পাস।
ছেলে তো ম্যাট্রিক পাস
এই ছেলে হবে?

এখন বিয়ের জন্য চাকরি, টাকা এসব লাগে
এম.এ পাসের জন্য এম.এ পাস নাই আর।
অথচ, তথাকথিত এম.এ পাসেরা
বাল্যবিবাহ করছে অবাধে।

দেশ থেকে বাল্যবিবাহ দূর করতে চান?
আর যারা বাল্যবিবাহকে না বলে সামনে এগুলো
তাদের জন্য কি রইল?
ম্যাট্রিক পাস?

বাল্যবিবাহ করলাম না
বাবা-মার পাশে দাঁড়ালাম
নারী শিক্ষার হার বাড়ালাম
এম.এ. পাস করলাম।

পেলাম টা কি?
১১/১২ তে গঞ্জনা।
এম.এ পাস, অসুন্দর, চাকরি নাই
তাই এখন পাই যাতনা।

এভাবেই হাজারো নারী
দিনে রাতে পায় কষ্ট, যাতনা।
দেখার মতো নেই কেউ
নাই কারে মাথা ব্যথা।

আমি তো নিজের বাল্যবিবাহ রোধ করলাম
এই কি তাহলে তার প্রতিদান?
মা, বাবা, সমাজ সবার কাছে
নেই আমার আর মূল্য।
তাই না?

আজ আমি এম.এ পাস
কিন্তু সৌন্দর্য, টাকা, চাকরি না থাকাই
আমি অবহেলিত।

ফাতেমা মোস্তারিন
২য় বর্ষ, সংস্কৃত বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

নারীর সম্মান

স্বাধীন স্বাধীন স্বাধীন আমি
স্বাধীন আমার দেশ।
দু'লক্ষ মা বোনের ইজ্জৎ এর বিনিময়ে
পেয়েছি স্বাধীন দেশ।
তবু কেনো স্বাধীন দেশে
নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে দেশ।
এই কি আমার স্বাধীন দেশ?

তখনও ছিলো এখনও আছে,
ধর্ষণ আর নিপীড়ন।
তবে কবে বলো নির্মূল হবে
নারীর প্রতি অসম্মান?
নারীর গর্ভে জন্ম নিয়ে
করি না কখনও নারীকে সম্মান।
ধর্ষণ নয় ধর্ষক কমাও
ফিরিয়ে আনো নারীর সম্মান।

ধর্ষণের শাস্তি হোক সর্বোচ্চ কঠিন
প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম যেন মনে রাখে
ধর্ষণের শাস্তি কঠিন।

আর নয় এদেশে ধর্ষণ, নিপীড়ন
আর নয় কোনো নারীর অসম্মান।

আমি বলি কেবল অপরাধীকে নয়,
অপরাধকে শাস্তি দাও।
তাহলে কমবে ধর্ষণ, নিপীড়ন
নারী হবে মহীমাময়।

মো: সাব্বির হাসান
ব্যবস্থাপনা (২০১৮-১৯)
ইসলামিয়া সরকারি কলেজ, সিরাজগঞ্জ।

গল্প

গোধূলি সন্ধ্যা

ঘড়িতে সকাল ৭.৩০ মিনিট। এলার্ম বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং ক্রিং। ইস! আমার সাধের ঘুমের শত্রুটাকে কে যে অন করে রাখছে! ধুর ভাল্লাগেনা, আর একটু ঘুমাই।

-রীদি, এই রীদি ঘুম থেকে উঠবি না? অনেক বেলা হয়ে গেছে তো। তোর না আজ কলেজে প্রোগাম আছে।

-উফ! মা, আর একটু ঘুমাই।

-৮ টা কিন্তু বাজে পরে আমাকে দোষ দিতে পারবি না যে আমি ডাকি নাই।

-ইস, মা আর একটু আগে ডাকতে পারলা না?

-আমি যে তোর ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রেখেছিলাম, তুই তো আগের মতোই, বন্ধ করে আবার ঘুমাইছিস।

-উফ! মা, উঠতেছি। সকাল সকাল তোমার বিবিসি চালু করো না তো।

-আমি ভাল কথা বললেই দোষ, যা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে।

-যাচ্ছি তো।

এ হচ্ছে রীদিকা। যার প্রিয় কাজ হচ্ছে ঘুমানো। আর সব থেকে প্রিয় ব্যাক্তি তার মা। কারন তার মা ছাড়া আর কেউ নেই এই ভুবনে। তার মা এস আর ত্বাহা। সে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে। তা দিয়ে তাদের মা-মেয়ের চলে যায়। আর রীদিকা এবার সম্মান শ্রেণীর প্রথম বর্ষে পড়ে।

-মা, চুল টা জট লেগেছে ছাড়িয়ে দাও না।
-এতো বড় একটা মেয়ে এখনো নিজের কাজ নিজে করতে জানে না।
-আমার কাজ গুলো তুমি না করলে কে করবে শুনি?বসারাদিন তো অফিসে থাকো। বাড়িতে যে একটা মা আছে তার সেবা যত্ন করতে হবে না? এভাবে বসে থাকলে তো আরও গুলু মুলু হবে।
-ওরে দুষ্ট মেয়ে।

রীদিকার কলেজে আজ নবীন বরণ অনুষ্ঠান আছে। তাই তৈরি হয়ে তাড়াতাড়ি কলেজে যাওয়ার জন্য বাড়ির বাইরে বের হওয়ার সময় মনে পড়ল তার বাবাকে তো দেখানো হলো না, সে কত সুন্দর করে সেজেছে। তাই ঘুরে এসে বাবার ছবির

সামনে দাঁড়িয়ে বলল-বাবা, দেখো তোমার রাজকন্যা কিভাবে সেজেছে। আর বলতো কে বেশি সুন্দর আমি না মা? নিশ্চয়ই আমি তাই না বাবা?

এসব দেখে ত্বাহা ইসলাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

কলেজ থেকে ফিরে রীদিকা মায়ের জন্য খাবার বানিয়ে অপেক্ষা করে কখন তার মা আসবে। কিন্তু সে জানে তার মা আজকে বাড়ি ফিরবে না। কারন কালকে যে ১৩ই আগস্ট। এই দিনের আগের দিন মা বাড়ি ফিরে না। একদম ১৪ তারিখ বাড়ি আসে। এই রহস্য তার অজানাই আছে এখনো। এতোদিন অনেক চেষ্টা করে তা জানতে পারে নাই। না জানতে পেরেছে তার বাবার কিভাবে মৃত্যু হয়েছে। সে জন্মের পর থেকেই তার বাবাকে ছবিতে দেখে আসছে শুধু। সবার বাবা আছে, দাদু-দাদি, চাচা-চাচি, ভাই-বোন আছে। কিন্তু তার কেউ নেই কেন? যতবার জানতে চেয়েছে তার মা ততোবার নানারকম কথা বলে এড়িয়ে গেছে বিষয়টা। তার আরও অনেক কিছু অজানাই রয়ে গেছে। যেমন- তার মা প্রতিরাতে কাকে যেন ফোন করে তারপর কান্না করে।

১৩ই আগস্ট সকাল এ মানসিক হাসপাতাল এর সামনে দাঁড়িয়ে আছে ত্বাহা। ভয়ে ভয়ে হাসপাতাল এর ভিতরে ঢুকে ২০৪ নাম্বার রুমের রোগীর কাছে গেলো। তিনি রোগীকে খাবার খাইয়ে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ করে কাঁধে কারো ছোঁয়া পেয়ে পিছনে তাকায়। দেখতে পায় সেখানে আর কেউ নয় তার মেয়ে রীদি দাঁড়িয়ে। ত্বাহা ইসলাম ভয়ে কাঁপতেছেন কারণ আর সত্য গোপন রইল না। অন্যদিকে রোগীটি রুমের চেয়ার উঠিয়েছে রীদিকে মারার জন্য। সাথে সাথে ত্বাহা ধরে ফেলে আর ডাক্তারকে ডাকে। রীদিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে সাথে সাথে। রাস্তায় কেউ কারো সাথে কোন কথা বলে নি।

অতীতে রীদিকা জানতো যে, তার মা এইদিন বাইরে যাবেই তাই সে আগে থেকেই তার বান্ধবীকে বলে মায়ের ফোন এর লোকেশন চেক করার জন্য। সেই লোকেশন চেক করেই আজ সকাল এ মানসিক হাসপাতালে পৌঁছায়। আর অবাক হয়ে যায় তার মা এখানে কি করে। তার থেকে বেশি অবাক হয় যখন দেখে তার মা একটা লোককে খাবার খাওয়াচ্ছে তা আর কেউ নয়

এতোদিন যাকে বাবা ভেবে এসেছে। আর সে জানে হয়তো বাবা মারা গেছে। কিন্তু আজ দেখতেছে তার বাবা জীবিত, আবার তার বাবা একজন পাগল। রীদিকার মনে নানা প্রশ্ন জাগতেছে, বাবা পাগল হোক আর যাই হোক তার মা কেনো তার থেকে লুকিয়েছে। কেন তাকে এতোদিন জানায় নি। এসব ভাবতেছিল রীদিকা।

-নামো, আমরা বাড়ি পৌছে গিয়েছি।

তার মায়ের কথায় কল্পনার জগত থেকে ফিরে আসে।

বাড়িতে আসার পর রীদিকা তার মা কে কিছু বলার আগেই তার মা বলল

-আমি জানি তুই কি বলতে চাস, আমি এখন অনেক ক্লান্ত। ঘরে যাচ্ছি। কিছু সময় পর কফি নিয়ে বেলকনিতে অপেক্ষা কর আমি আসতেছি।

বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, মা-মেয়ে দুজনে কফি খাচ্ছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। কেউ কোন কথা বলছেনা। আগের দিন হলে এতক্ষণ দুজনে খুনসুটিতে মেতে উঠত। কিন্তু আজ দুজনে নিঃশ্চুপ। প্রথমে ত্বাহা ইসলাম শুরু করলেন।

-তোর বাবার সাথে যেদিন দেখা হয়েছিল প্রথম সেদিন ও বৃষ্টি ছিল। দিনটা ছিল ১৩ই আগস্ট।

আমি তখন একাদশ শ্রেণীতে পড়তাম। কলেজ হোস্টলে থাকতাম। কলেজে কমপক্ষে ৩০০ ছাত্র ছাত্রী ছিল। কেউ কাউকে ভাল করে চিনতাম না। যে কয়েকজন এর সাথে প্রাইভেট পড়তাম তাদের কেও ভাল করে চিনতাম না। শুধু ১০ জন মেয়ে সার্কেল, এই হলো আমার বান্ধবী। হোস্টেল থেকে বাড়ি এসেছিলাম। যাওয়ার দিন স্টেশনে আসার পর পরই বৃষ্টি শুরু হলো। কোন রকম ছাতা নিয়ে অটো খুঁজছিলাম। একটা অটো ডাকল, জায়গা আছে আসুন। আমি মনে করলাম অটোর ভিতরে কেউ নেই। তাই ধুপ করে অটোতে বসলাম। একজন এর চিৎকার শুনে পাশে তাকিয়ে দেখি একটা ছেলে বসে আছে আর আমি তার পা তে পারা দিয়ে বসেছি। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। আর না দেখে বসার জন্য ক্ষমা চাইলাম। অটো চলা শুরু করল। কিছু সময় পর ছেলেটা বলল,

-আপু কোথায় যাবেন আপনি?

-আমি সরকারি কলেজের গেটে নামব।

-আমি ও তো ওখান এ নামব। কোন ক্লাস এ পড়েন আপু?

-একাদশ শ্রেণিতে। আপনি?

-আমিও, বিজ্ঞান বিভাগে আমি।

-আমিও।
-কই আপনাকে তো কখনো দেখি নাই ক্লাস এ?
-এতো ছাত্র ছাত্রী এর মাঝে কে কাকে মনে রাখবে।
এভাবেই পরিচয় জানলাম। তোর বাবার নাম ছিল এস আর মৃন্ময় ইসলাম। পরের দিন দেখি তোর বাবাকে আমি যে যে প্রাইভেট পড়ি সেই জায়গাতে। অথচ দুমাস এর ও বেশি সময় প্রাইভেট পড়ি কিন্তু কেউ কাউকে চিনি না। ওইদিন ক্লাস এ তোর বাবা আমার কাছে এসে বলল,
-কিছু মনে না করলে তোমার পদার্থ খাতাটা দেওয়া যাবে? কিছু অনুশীলনী এর কাজ করতে পারি নাই তো।
-কেন নয়। এই নাও খাতা।
সেদিন একে অপরের মোবাইল নাম্বার ও নিলাম। সেদিন থেকে একে অপরের নোট খাতা নেওয়া, কলেজে কথা বলা, দিনে ফোন দিয়ে খোজ নেওয়া। এভাবেই দুজনের মাঝে ভাল বন্ধুত্ব তৈরি হল। আমাদের সম্পর্ক তুমি থেকে তুইতে চলে এলো। ফোন করে খোঁজখবর নেওয়া, কে কতবার ফোন দিয়ে খোঁজ নিতে পারি, কে কার আগে ঘুম থেকে উঠে প্রথম ফোন দিতে পারি এসব এর

প্রতিযোগিতা চলছিল, সাথে পড়াশোনারও। এভাবেই আমাদের ইয়ার চেঞ্জ হয়ে গেল। মৃন্ময় চাইতো না আমি অন্য কোন ছেলের সাথে কথা বলি। কথা বললে রাগ দেখাতো। নোট খাতা চাইলে বলতো যে ছেলেটার সাথে কথা বললি ওর কাছে নে। আমি দিবো না খাতা। তখন বুঝতাম আসল ঘটনা কি। এভাবেই চলছিলো দুজনের বন্ধুত্ব। একদিন মৃন্ময় ফোন দিয়ে বলল,

-দোকানে গিয়ে ৫০০টাকা বিকাশ করে দে তো।

-এতো টাকা কি করবি তুই?

-বেশি বকবক না করে যা বললাম কর, তাড়াতাড়ি।

আমি দোকানে গিয়ে টাকা দিলাম। ওর রুমমেটকে ফোন দিয়ে বললাম যে মৃন্ময় কোথায়। ওর রুমমেট বলল দুজনে আমরা বড় বাজার এ আসছি। আমি তোকে একটা মেসেজ দিচ্ছি দেখ। মেসেজটা দেখার পর প্রচুর হাসলাম। মেসেজ এরকম ছিলো যে তোর বাবা কোন মেয়ের সাথে দেখা করতে গেছে আর সে সব টাকার কাপড় কিনেছে, রেস্টুরেন্টের খাবারের বিল দিতে গিয়ে দেখে মানিব্যাগ ফাঁকা। বাধ্য হয়ে আমাকে ফোন দেয়। তোর বাবা এর কোন মেয়ের সাথে সম্পর্ক

বেশি দিন যাইতো না। টেস্ট পরিক্ষার পর আমি একদিন তোর বাবার সাথে ডাক্তার দেখাইতে যাই। মৃন্ময় আমার টেস্টের রিপোর্ট আনতে যায় আর ওর ফোনটা আমার কাছে ফেলে যায়। তখন একটা মেসেজ আসে। বুঝলাম যে আবার নতুন কোন মেয়ে পটাচ্ছে। তা দেখে হাসলাম। ডাক্তারের ওখান থেকে আসার সময় বললাম

-নতুন মেয়েটা কে?

-বলল তুই চিনবি। তোকে বলা যাবে না। তুই ব্রেকাপ করায় দিবি।

আমি তখন কিছু বললাম না। কিন্তু নাম্বারটা মনে রেখেছি। হোস্টেলে এসে নাম্বারে ফোন দিয়ে দেখি আমার এক বান্ধবী বৃষ্টি। যারও কিনা তোর বাবার মতো অনেক ছেলের সাথে সম্পর্ক। ঠিক দুইদিন পর তোর বাবা বলতেছে,

-আমি মনে হয় ফাইনাল পরিক্ষা দিবো না।

-কেনো দিবি না? তুই তো আমার থেকেও ভাল ছাত্র।

-পড়াশোনা করি না রে সারাদিন ওর সাথে (বৃষ্টি) কথা বলতেই যায়।

এটা বলার পরপরই আমার সামনে সিগারেট ধরাল। যে ছেলে এতোদিন সিগারেট খেলে আমার

সামনে আসার আগে ব্রাশ করে আর আজ আমার সামনে সিগারেট ধরাল। মাথা খারাপ হয়ে গেল। তখন ওকে কিছু না বলে হোস্টেল এ চলে আসলাম। ওর ভাই আর আপুর মোবাইল নাম্বার আমার কাছে ছিল। ফোন করে সব বলে দিলাম। আর এও বললাম কাল সকালেই যেন বাড়ি নিয়ে যায়। কারন টেস্টের পর প্রাইভেট সেরকম করার দরকার নেই। ওকে যেনো ভাইয়া নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখে। পরের দিন সকাল এ ফোন দিয়ে মৃন্ময় দেখা করতে বলল। বলল যে আমি বাড়ি যাচ্ছি। ওকে বললাম ভাল করে পরলে হোস্টেলএ থাকতে পারতি। এখন বুঝ কেমন লাগে। মৃন্ময় বুঝে গেল সব কারসাজি আমার। তখন কিছু না বলে চলে গেল। বাড়িতে যাবার পর নতুন সিম কিনল। সব মানলো ওর আপু যা যা বলল, কিন্তু সে ভাইয়ার কাছে গিয়ে থাকবে না। ভাইয়া ফোন দিলো আমাকে ওকে বুঝানোর জন্য। কিন্তু সে আমার ফোন ধরে না। আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিল। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো কথা বলতে না পেরে। না পড়াশোনা করতে পারতেছি, না ঘুমাতে, না খাইতে। মৃন্ময় কে ছাড়া আমার জীবনটায় অচল হয়ে গেল। আমি

বুঝতে পারলাম আমি ওকে বন্ধুর চেয়েও বেশি কিছু ভাবি। প্রতিদিন মেসেজ এর উপর মেসেজ, ফোন দেওয়া শুরু করলাম। একসপ্তাহ পর ফোন ধরল। কিন্তু খাপ ছাড়া কথা বলা শুরু করল। ওকে বললাম,

-তুই ভাল করে কথা বলছিস না কেন?

-কই ভাল করে বলছি তো।

-তুই নাকি ভাইয়ার কাছে যাবি না, বাড়িতেও পড়াশোনা করতেছিস না। তুই আসলে কি করতে চাচ্ছিস বলতো?

-পড়াশোনা আমাকে দিয়ে হবে না, আমি পড়াশোনা ছেড়ে দিবো।

আবার মাথা খারাপ হয়ে গেল সারাদিন বুঝানোর পর এটা সিদ্ধান্ত নিলো যে, ওকে যেভাবে বাড়ি পাঠাইছি সেভাবে যদি আবার হোস্টেলে নিয়ে যেতে পারি তাহলে পড়াশোনা করবে। না হলে নাই। আমি অনেক কষ্টে ওর বাড়িতে রাজি করালাম আর ওর দায়দায়িত্ব নিজে নিলাম। তখন পরের দিন হোস্টেলএ চলে আসল। আর আমার দেহে মনে হল প্রাণ ফিরে আসল। আবার আগের মতোই হয়ে গেলাম। বন্ধুত্ব এর কাছে আমার ভালবাসাটা ঢাকা পরল। মনকে বললাম ও তো

আমারই আছে। চলুক না বাকি দিন গুলো। কেন ভালবাসি কথাটা বলে বন্ধুত্বটা নষ্ট করি। ওর মনের অগোচরে ওকে একটু একটু করে ভালবাসতে শুরু করলাম। এভাবেই এইসএসসি শেষ হলো। দুজনে দু'প্রান্তে চলে গেলাম ভর্তি পরিক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। দুরে থাকলেও মনের মাঝে শুধু তারই বাস ছিল। দুজনে ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। সাথে যতদিন যাচ্ছে মৃন্ময় আমার থেকে দূরে যাচ্ছে। সে প্রতিনিয়ত আর ও বেশি মেয়েদের সাথে মিশতে লাগল আমার খোঁজ নেওয়া বন্ধ করল। আমি ফোন করলেও দায়সারা ভাবে কথা বলতো। তাই ভালবাসাটা নিজের মনেই কবর দিয়ে দিলাম। ওকে কখনো বলে উঠতে পারি নাই কতোটা ভালবাসি আমি। এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন শেষ করলাম। একদিন মৃন্ময় এর আপু ফোন দিলো। আমি বিস্ময় নিয়ে মোবাইলটার দিকে তাকালাম আসলে আপু কি না। দ্বিধা নিয়ে ফোন ধরলাম। আপুর গলা ভাঙ্গা, মনে হচ্ছে অনেক কষ্টে কথা বলতেছে। আমাকে বলল যেখানে থাকিস না কেন আমাদের বাড়ি চলে আয়। আমি বললাম কি হয়েছে আপু? আপু শুধু বলল যে

বাড়ি আসলে সব জানতে পারবি। আমি অনেক উৎকন্ঠা নিয়ে পৌঁছালাম। গিয়ে দেখলাম মৃন্ময় নেশায় বুদ হয়ে আছে আর একটা বাচ্চাকে আছাড় মারার চেষ্টা করতেছে কেউ আটকাতে পারছে না। আমি দৌড়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে কেড়ে নিলাম। দেখতেছি ছোট একটা পরী সুন্দর করে ঘুমিয়ে আছে। তারপর আপুকে বললাম মৃন্ময় এর এই অবস্হা কেনো? আর এই বাচ্চাটা কার? আপুর কাছে জানতে পারলাম মৃন্ময় ২ বছর আগেই বিয়ে করেছে। আর এই বাচ্চাটা মৃন্ময় এর। এটা শোনার পর পুরনো ব্যাথাটা আবার শুরু হল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বললাম তাহলে মৃন্ময় এর বউ কোথায় আর ওরই এই অবস্থা কেনো? এরপরে যেটা শুনলাম সেটার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। মৃন্ময় এর বউ নাকি অন্য পুরুষদের সাথে মিশত। তাই মৃন্ময় বাচ্চা নিতে বলল। যাতে সে সঠিক পথে আসে। অনেক ঝগড়ার পর বাচ্চা নিলেও তার আচার আচরণে পরিবর্তন আসল না। মৃন্ময় ভাবল মা হওয়ার পর সব স্বাভাবীক হবে। কিন্তু যেদিন বাচ্চা হল ঠিক তারপরের দিনেই একটা চিঠি লিখে বাচ্চাটাকে ছেড়ে মৃন্ময় এর এক বন্ধু এর সাথে পালিয়ে যায়।

যার কারনে মৃন্ময় এখন নেশা করে। বাড়ির মানুষ অথৈ সাগরে পড়ে গেল। ছোট একটা বাচ্চাকে কে সামলাবে আবার একদিকে মৃন্ময় নেশা করে। তাই সবাই সিদ্ধান্ত নিলো আবার মৃন্ময় এর বিয়ে দিবে বাচ্চাটা মাও পাবে আর মৃন্ময় ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। ছোট পরীটা তখন আমার কোলে ঘুমিয়ে ছিলো। ওর দিকে তাকিয়ে এক অজানা মায়া কাজ করল। আমি মনে মনে ভাবলাম এটায় সুযোগ নিজের ভালবাসার মানুষটাকে আপন করার। তাই সাথে সাথে আমার বাড়িতে ফোন দিয়ে মৃন্ময় এর বাড়িতে আসতে বললাম। সবাই আসার পর জানালাম আমি মৃন্ময় আর ওর বাচ্চার দায়িত্ব নিতে চাই। কিন্তু আমার বাবা মা কোনমতে রাজি হচ্ছিলো না। তাদের এক কথা তারা একটা মাতাল তাও আবার একটা বাচ্চা আছে তার কাছে কোন ভাবেই মেয়ে দিবে না। আমি তাদের বোঝাতে চাইলাম মৃন্ময়কে আমি অনেক আগে থেকে ভালবাসি। কিন্তু সব চেষ্টা বিফলে গেল। তখন আমি ছুটে মৃন্ময় এর কাছে গেলাম, ওর নেশা কাটিয়ে ওকে বললাম আমি তাকে ভালবাসি, আর এই ছোট পরীটার মা হতে চাই। কিন্তু মৃন্ময়

আমাকে অপমান করল। বলল সব মেয়েরা ছলনাময়ী, আর বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলতেছে এও একদিন কারো সাথে ছলনা করবে। তারচেয়ে আমার কাছে দে, এখানেই একে মেরে ফেলি। আমি আতকে উঠে বললাম মৃন্ময় তুই পাগল হয়ে গেছিস, এতটুকু সুন্দর একটা বাচ্চাকে মারার চেষ্টা করতেছিস। মৃন্ময় কে পাবার যেটুকু আশা ছিলো তাও গেলো। রাগে দুঃখে ঘর থেকে বের হয়ে আসলাম। মৃন্ময় এর আপু বলতেছে যে, যেহেতু মৃন্ময় বাচ্চাটাকে সহ্য করতে পারতেছে না একমাস ধরে আমি সামলিয়েছি আর পারব না, বাচ্চাটাকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে আসবো। আমি অবাক এদের কথা শুনে। এরা এতটা অমানবিক কি করে হচ্ছে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম বাচ্চাটা আজ থেকে আমার কাছে বড় হবে যতদিন না মৃন্ময় সুস্থ জীবনে ফিরে আসছে। আমার বাবা মা তো সাথে সাথে নাকোচ করে দিল। আর মৃন্ময় এর বাড়ির লোক জানাল তারা বাচ্চার কোন দায়িত্ব নিতে পারবে না। আমি আমার বাবা মা এর সাথে বিরোধিতা করে বাচ্চাটাকে বুকে নিয়ে নতুন শহরে পাড়ি দিলাম। তার কয়েকমাস পর জানতে পারলাম যে মৃন্ময় নেশা করে বাইক চালানোর

জন্য দূর্ঘটনা ঘটায়, যার ফলে মাথায় আঘাত পায় আর মানসিক ভারসাম্য হারায়। তখন থেকে মৃন্ময় এর স্থান হলো মানসিক হাসপাতালে। কেউ মৃন্ময় এর খোঁজ নেয় না। পারলে আমি গিয়ে একটু খোঁজ নেই। আর এতো বছরেও একটুও উন্নতি হয় নি মৃন্ময় এর। এসব বলে থামল ত্বাহা ইসলাম। এতো সময় রীদিকা চোখ বন্ধ করে এসব শুনছিলো। তার মা যখন চুপ হলো তখন সে চোখ খুলে মাকে একটায় প্রশ্ন করে,

-মা সেদিন এর সেই বাচ্চাটা বুঝি আমি?

-ত্বাহা ইসলাম ছলছল চোখে মাথা ঝাকিয়ে বুঝালো হ্যাঁ।

এটা শোনার পর রীদিকা দৌড়ে ঘরে চলে গেল। তার প্রচন্ড কান্না পাচ্ছে যে এতোবছর যাকে মা বলে জানে সে আসলে তার মা নয়। তার মা তাকে জন্মের পরপরই ফেলে চলে গেছে। আর এইদিকে ত্বাহা ইসলাম দুচিন্তা করতেছে যে আবেগের বসে তো সব বলে দিল যদি তার মেয়ে তাকে ছেড়ে চলে যায়। তার তো তার মেয়ে ছাড়া কেউ নেই। রীদি চলে গেলে কি নিয়ে বাঁচবে সে। এভাবেই চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে ত্বাহা ইসলাম বুঝতে পারে নি।

ভোরে তার মেয়ের ডাকে ঘুম ভাঙ্গে।
-মা তাড়াতাড়ি উঠ, নামাজ এর সময় চলে যাচ্ছে।
ত্বাহা ইসলাম ভাবতেছেন তিনি স্বপ্ন দেখতেছেন।
যে মেয়েকে ফজরের নামাজ পড়াতে পারে নাই
ঘুম এর জন্য, সে আজ আমাকে ডাকতেছে।
আবার ও ঘোর কাটে রীদিকার ডাকে।
-কি হল মা, কি ভাবতেছো? তাড়াতাড়ি উঠো এক সাথে নামাজ পড়ব।

মা-মেয়ে নামাজ পরে, সকালের নাস্তা বানাতে শুরু করল। সাথে আগের মতোই খুনশুটি। এভাবেই মা ও মেয়ের নতুন এক সকাল শুরু হলো।

দীপা রায়
২০১৮-২০১৯ সেশন,
ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্সেস বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এক পলকে অভিশপ্ত

বদ্ধ ঘরে জানালার পাশে এলোমেলো চুল খুলে দাঁড়িয়ে আছি। আকাশটা অন্ধকার মেঘে ঢেকে আছে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে, কিন্তু বৃষ্টির কোনো চিহ্ন নাই। যদি বৃষ্টির ছোঁয়ায় সব অভিশাপ ধুয়ে মুছে নিয়ে যেত। এইসব ভাবতে ভাবতে চোখ দিয়ে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। কিছুদিন আগেও আমার জীবনটা ছিলো স্বাভাবিক, হাসি-খুশি আর আনন্দমুখর। আজ তা সবই কল্পনা। এই কিছুদিন আগেও আমি ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়তাম। আজ সবই তা অবাস্তব অধ্যায়। পড়াশোনায় ভালোই ছিলাম। ইচ্ছা ছিল পড়াশোনা করে মা-বাবার পাশে দাঁড়াবো। হঠাৎ পৃথিবীতে মহামারি করোনার কারণে সবকিছু লকডাউন করে দেওয়া হলো। সেই কারণে কলেজও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলো। প্রথম একমাস পরিবারে সাথে ভালোই কেটেছে। লকডাউনে কারণে বাবার দোকানের বেচাকেনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। স্বল্প পুঁজি দিয়ে বাবা দোকান শুরু করেছিল। সেই দোকানের আয় দিয়ে বাবা, মা আর ছোট ভাইকে নিয়ে ভালোই কাটছিলো। কিন্তু একমাত্র উপার্জনের

পথ যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন হতাশা ছাড়া কিছুই থাকে না। বাসাভাড়া, খাওয়া খরচ সব মিলিয়ে বাবার পক্ষে সংসার চালানো খুবই কষ্টে পরিণত হলো। কয়েকমাস যাওয়ার পর দেশের সবকিছু সীমিত পরিমাণে চালু করা হলো। আর্থিক অবস্থা খারাপের কারণে বাবা সবাইকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। গ্রামে ফুফুদের বাড়িতে উঠলাম সবাই। ফুফুদের বাড়িতে এক আত্নীয় আমাকে দেখে পছন্দ করে এবং খুব অল্পসময়ের মধ্যে বিয়ে কথাবার্তা ঠিক হয়ে যায়। পরিস্থিতি এতোটা প্রতিকূল ছিল যে, বাবার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও আমাকে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। বিয়ে করার কোন ইচ্ছা ছিল না আমার কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়ে সবকিছু মেনে নিতে হলো।

পুরানো সব স্বপ্ন পাথরে চাপা দিয়ে আবার নতুন কিছু গড়ার স্বপ্ন দেখা শুরু করি। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর স্বামীর জ্বর-কাশির উপসর্গ দেখা দেয়। আমি তার সেবা করা শুরু করি। তবে কয়েকদিন পর আমারও একই উপসর্গগুলো দেখা দিল। স্বামীর অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করলাম। আমাদের দুইজনের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসলো। আমি বাসায়

থেকে ঘরোয়াভাবে চিকিৎসা নিলাম আর অল্প কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হতে শুরু করলাম, কিন্তু তখনো পুরাপুরি সুস্থ ছিলাম না। তবে উপসর্গের পনেরো দিনের মাথায় আমার স্বামী পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আমি হয়তো বা এই যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলাম কিন্তু বাস্তবে ঠিক যেন এক প্রাণহীন লাশ। শুধু মনে হলো জীবনটা এক পলকে রঙহীন অভিশপ্ত হয়ে গেল।

হঠাৎ বৃষ্টি পড়া শুরু হলো আর আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকলাম সবকিছু হয়তো বা ঠিক হয়ে যাবে। আমার অস্তিত্ব হয়তো বা বৃষ্টি ফোঁটায় হারিয়ে যাবে। কিন্তু আমার গল্পটা অজানা হয়ে থাকবে। হয়তো নতুন পৃথিবীর মোড়কে নিজেকে গুছিয়ে নিব নাহলে হারিয়ে যাবে এক অজানা দিগন্তে।

ফ্লোরা পারভীন তামান্না
Biochemistry & Biotechnology,
University of science & technology,
Chittagong (USTC)

নিয়তি

বিশ্ববিদ্যালয় আজ প্রায় চার মাস ছুটি হয়েছে। ঘরে বসে থাকতে থাকতে খুবই বিরক্ত লাগছিল, সমস্ত শরীরে যেন প্রচন্ড এক অলসতা বাসা বেধেছে। কোন কাজে মন বসেনা, জীবনটা কেমন যেন খাপছাড়া আর একগুয়ে স্বভাবের হয়ে গেছে। ইচ্ছে করে বাইরে কোথাও ঘুরে আসি। কিন্ত সারা পৃথিবীজুড়ে ভয়ঙ্কর এক মহামারী দেখা দিয়েছে, করোনা। এটা এক ধরনের ছোঁয়াচে রোগ, যার কোন প্রতিশেধক এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। একারনেই দেশের সকল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবী এই ভয়ঙ্কর রোগের কারনে অচল হয়ে পড়েছে। বিনা কারনে ঘর থেকে বেরোনো নিষেধ করা হয়েছে। তাই মন চাইলেও বাইরে যাওয়ার উপায় ছিলো না! তাছাড়া বাবা-মায়ের কঠোর অনুশাসন তো আছেই।

যাই হোক গত পরশুদিন সকালে খেয়ে দেয়ে যথারীতি মোবাইলটা নিয়ে শুয়ে শুয়ে ভিডিও দেখছি। তখন কাকা এসে বললেন আমাকে একটা কাজের জন্য শহরে যেতে হবে। মনে মনে ভীষণ উত্তেজনা হলেও বাইরে সেটা প্রকাশ করলাম না। কাকা যেতে বলেছে তাই মা-বাবাও আর কিছু বলতে পারলো না। যাইহোক আমি বাড়ি থেকে বেরলাম। মনে মনে অনেক আনন্দ হচ্ছিল। এতদিন পর চিরচেনা সেই শহরে যাচ্ছি। এই শহরেই আমার কলেজ জীবন শেষ হয়েছে। আমার অনেক পরিচিত বন্ধু-বান্ধবী আছে। অনেক স্মৃতি বিজড়িত এই শহর। শহরে যেতে যেতে পথেই এক বন্ধু, হাবিবকে ফোন করে বললাম আমি আসছি। তুই বের হ। দুইবন্ধু মিলে সেই পুরনো দিনের মতো ঘুরবো। সোহাগ কাকুর চায়ের দোকান, যার দোকানে রোজ সন্ধ্যায় চায়ের কাপে মুখ দিতে দিতে আড্ডা জমতো। সেই বাঁধাঘাট, যেখানে কেয়া ম্যাডামের কাছে পড়া শেষে আড্ডার

জায়গা ছিলো, তাছাড়া আরও অনেক জায়গা ছিলো। আজ আবার সেসব জায়গা যাব। কিন্তু তার ও বাড়ি থেকে বাইরে আসা বন্ধ। তাকেও বাড়ি থেকে বাইরে আসতে দিবে না শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। হতাশ হয়ে আমি যে কাজের জন্য এসেছি তা করতে গেলাম। একটু পরেই হাবিব ফোন করে বললো ওর বাবা অফিস গেলেই মায়ের কাছে কিছু একটা অযুহাত দিয়ে সে ঠিকই চলে আসবে। যাইহোক মনে কিছুটা ভালোলাগা কাজ করলো এবং আমার কাজ শেষ হতে না হতেই দেখলাম সে হাজির। অনেকদিন পর বন্ধুকে কাছে পেয়ে অনেক আনন্দ লাগছিলো। তারপর দুইজনে মিলে সোহাগ কাকুর দোকান থেকে চা খেলাম। দোকানে অবশ্য কাকু ছিলেন না। তার ছেলে ছিল। তারপর হাবিব আজ আমাকে নতুন একটা জায়গার নাম বললো, চরেরঘাট। বললো জায়গাটা নকি খুবই সুন্দর এবং আজ আমরা ওখানেই যাব। নামটা আমার পরিচিত মনে হলেও চেনা ছিল না। সেখানে গিয়ে দেখলাম জায়গাটা আসলেই অনেক সুন্দর। নদীর তীরে পাশাপাশি বিরাট দুটো বটগাছ। একটা গাছের নিচে বসার

জন্য ইটবালু সিমেন্ট দিয়ে বসার জায়গা বানানো। কিন্তু আমরা সেখানে জায়গা পেলাম না। অন্য বটগাছটা একটু দূরে। একেবারে নদীর কিনারে। প্রচন্ড রোদে আমরা অন্য গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিতে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। গাছের শিকড়গুলো মাটি ফুড়ে বেরিয়ে গেছে। তার উপর বসতেও পারবো। ওখানে পাশেই একজন ভদ্রলোক দাড়িয়ে ছিলেন, নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে কি যেন একটা ভাবছেন। বয়স আনুমানিক ৭০ এর কাছাকাছি। ভদ্রলোকের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় আমি তার দিকে তাকাতেই দেখলাম উনিও আমাদের দিকে মুখ ফেরালেন। চোখে চোখ পড়ে গেল। উনি একটা মিষ্টি হাসি দিলেন। আমাদের জিজ্ঞেস করলেন,

-বাড়ি কোথায় তোমাদের?

হাবিব উত্তর দিলো। আমি কোন কথা বললাম না। ভদ্রলোককে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের মতো গিয়ে বসলাম শিকড়ের উপর। তারপর গল্প করতে লাগলাম হাবিবের সাথে। লেখাপড়া, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। খেয়াল

করলাম লোকটা এখনও নদীর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভেবেই চলেছেন। হটাৎ আবার আমার দিকে তাকালেন। আবার চোখে চোখ পড়তেই আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম। দেখলাম ভদ্রলোক একটুপর আমাদের কাছে এসে দাড়ালেন। আমি কিছুই বললাম না। হটাৎ তিনি নিজেই আমাদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

-তোমাদের মতো বয়স একসময় আমারও ছিলো। কিন্তু আমাদের জীবন ছিলো একটু অন্যরকম। আমি মাঝেমধ্যে যখন এখানে এসে দাড়াই, নদীর দিকে তাকাই। একটা পুরোনো স্মৃতি আমার মনে পড়ে। মনে হয় এইতো এই সেদিন দুপুরবেলার ঘটনা। কিন্তু আসলে ঘটনাটা ছিলো একাত্তরের।

এই শেষ বাক্যটি শোনার সাথে সাথেই আমাদের মনের মধ্যে তার জন্য অন্যরকম একটা জায়গা তৈরি হলো। তার প্রতি আপনাআপনিই আমাদের একটা গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাস কাজ করতে লাগলো। আর হবে না-ই বা কেন! তিনি আমাদের

মহান মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষী! এইবার আমাদের কাছে নিজেদের গল্প গুরুত্বহীন হয়ে গেল এবং তার জীবনের সেই ঘটনা তথা মুক্তিযুদ্ধের সময়ের সেই ইতিহাস জানার জন্য মন ব্যাকুল হতে লাগলো। আমরা বইয়ে অনেক পড়েছি যুদ্ধের সময়কার নানান দুঃখ বিজড়িত ঘটনা। কিন্তু সেসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এরকম মানুষের কাছ থেকে শোনার মধ্যে অন্যরকম অনুভূতি আছে। যাইহোক আমি বললাম,

-আঙ্কেল, যদি কিছু মনে না করেন আমরা কি আপনার থেকে ঘটনাটি শুনতে পারি?

তিনি মুচকি হাসি দিলেন। অতঃপর বলতে শুরু করলেন।

-তখন ছিলাম তরুণ, মনের মধ্যে প্রতিশোধের আগুনটাও ছিল প্রখর। একটাই লক্ষ্য দেশকে বাঁচাতেই হবে। প্রান দিয়ে হলেও। আমার টিমও আমার কমান্ড যথাযথ পালন করেছে।

শুনেই বুঝতে পারলাম, ইনি শুধু মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ই নন, একজন সাহসী কমান্ডার।

আমি আমার দল নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ করতাম।

আচ্ছা তার আগে কটা বাজে আমাকে একটু বলো তো। আমার আবার একটু ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। আমার হার্টের বেরাম আছে ।

-১১ঃ৩৬ আঙ্কেল।

-আচ্ছা, ঠিকআছে, এখনও বেশ সময় আছে।

বলি তবে। শোনো, এই বলে তিনি আরম্ভ করলেন,

-আমাদের গ্রামেই ছিল একজন চোর, সে সব হিন্দু বাড়িতে চুরি করতো, আর মেয়েছেলেদের ধরে নিয়ে দিত খানেদের কাছে। পাকসেনারা আসার পর এলাকায় তার অনেক দাপট হয়ে পড়েছিল। সমস্ত অন্যায় অপরাধ প্রকাশ্যে করে বেড়াতো। কেউ তাকে কিছু বলতে পারতো না ভয়ে। আমি

একদিন রাতে আমার দলবলসমেত তাকে ধরে আনলাম। গ্রামের থেকে একটু দুরে ফাঁকা বিলের মধ্যে নিয়ে গেলাম। তারপর তাকে বললাম তার নিজের অপকর্মের জন্য ক্ষমা চাইতে। কিন্তু প্রায় পনের-কুড়ি মিনিট ধরে তাকে দিয়ে একটাবারের জন্যও ক্ষমা চাওয়াতেই পারলাম না। শেষে আমি নিজের সঙ্গীদের কাছে বললাম তোমরা কি বলো? একে কি ক্ষমা করা উচিত না মেরে ফেলা উচিত? তখন আমি একটা নির্বাচন পদ্ধতি করলাম। বললাম তোমরা যারা মনে করো মেরে ফেলা উচিত তারা পূর্ব পাশে আর যারা মনে কর ক্ষমা করা উচিত তারা পশ্চিম পাশে সরে যাও। দেখলাম পশ্চিম পাশে আমি এবং আরেকজনসহ মাত্র দুজন আছি, আর বাকি সবাই পূর্বপাশে। তখন আমি পূর্বে অবস্থানকারীদের জিজ্ঞাসা

করলাম, তোমরা কেন তাকে মেরে ফেলার পক্ষে? সে অন্যায় করেছে তাই বলে মেরে ফেলা লাগবে! তখন তারা সবাই উত্তর দিল আপনি ওকে কতোবার ক্ষমা চাইতে বললেন, কিন্তু সে একটিবার মুখ থেকে ক্ষমা শব্দটি উচ্চারণ পর্যন্ত করল না, তাছাড়া সে যে অন্যায়, যে পাপ করেছে, তাতে তার মৃত্যু হওয়ায় উচিত। আনিসের বোনের বিয়ে ঠিক হয়ছিল। ওই শয়তানের সাহায্যে পাকসেনারা মেয়েটাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে..। পরেরদিন খালের পাশে তার লাশ পাওয়া যায়, কী বীভৎস! আমাদের রতনকে ধরিয়ে দিয়েছিল এই হারামজাদা। আরও অনেক হত্যায় সাহায্য করেছে। ব্যাস, আর কোনো কথা নয়।। সকলের মতানুসারে তাকে গুলি করে বিলের পানিতে ঠেলে ফেলে দেওয়া হলো। দেখলাম সে

খুবই কষ্ট পাচ্ছিল। কচুরিপানার ঝোপের মধ্যে ফেলা হয়েছিল। সেখানে সে কোনভাবে মুখটা বের করে গোঙাচ্ছিলো, সে মর্মান্তিক দৃশ্য দেখা যায় না। তারপর তাকে বন্দুক দিয়ে কচুড়ির ঝোপের মধ্যে ঠেলে দিয়ে চলে এলাম। এই বলে তিনি থামলেন, পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে সময় দেখলেন। তারপর বললেন, এই নদীর সাথে আমার অনেক স্মৃতি আছে। ভুলতে পারি না। পৃথিবীর প্রত্যেক পিতামাতার কাছেই তাদের ছেলেমেয়ে সবথেকে প্রিয় হয়। মাতাপিতার মতো নিঃস্বার্থ ভাবে তার সন্তানকে আর কেউ ভালোবাসতে পারে না। আমাকেও আমার পিতামাতা তেমনই ভালোবাসতো। আরেকটা ব্যক্তিও আমাকে খুবই ভালোবাসতেন তিনি ছিলেন আমাদের ফুটবল খেলার কোচ। যিনি খেলা

শেখাতেন আরকি। তার বাড়ি ছিলো আমাদের পাশের গ্রামেই। একটা কথা বলে রাখি আমি কিন্তু তখন ভালো ফুটবল খেলতে পারতাম। একসময় বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে ফুটবল খেলেছি। কিন্তু সেটা অনেক আগের কথা, এখনকার কেউই সেটা মনে রাখেনি। তোমরাও একসময় দেখবে এখনকার যেসকল নামকরা খেলোয়াড়রা আছে বিশ-চল্লিশ বছর পরে তোমরাও তাদের ভুলে যাবে।

-হ্যা। তাতো ঠিকই। সময়ের সাথে সাথে এখনকার খেলোয়াড়দের বয়স হবে, নতুন নতুন খেলোয়াড় আসবে, তাদের ভীড়ে এখনকার সব হারিয়ে যাবে।

-হুম। ঠিক ই বুঝেছো। তো আমার যে কোচ ছিলেন, তার কাছ থেকে আমি অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। তিনি নিজের হাতে অনেক মেডেল আমাকে পরিয়ে দিয়েছেন। আমার মাথায় হাত

দিয়ে অনেক আদর করেছেন। তিনি খেলোয়াড়
হিসেবেও ছিলেন অসাধারন। তাছাড়া তিনি
একজন আনসার সদস্য হিসেবে কাজ করছেন।
অনেক শক্ত সামর্থ্য একজন মানুষ ছিলেন। কিন্তু
দুর্ভাগ্য আমার জাতীয় দলে খেলার ঘটনা তিনি
শুনে যেতে পারেনি।

বলতে বলতে ভদ্রলোকের চোখে জল চলে
এসেছে। চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন,
যাইহোক অন্যদিকে না গিয়ে ঘটনায় আসি। ১০ই
ডিসেম্বর ১৯৭১, নড়াইল স্বাধীন হয়ে গেছে। দলে
দলে খান সেনারা সবাই আত্মসমর্পণ করতেছে।
আমিও সেখানেই ছিলাম, রতনগঞ্জে। আমরা
আত্মসমর্পণ অস্ত্র সংগ্রহ করতেছিলাম। বেলা
আনুমানিক ২ টার সময় আমাদের খাবার খাওয়ার
জন্য ডাকতে এলো আমাদের দলের সবচেয়ে ছোট্ট

সদস্য, নাম ছিলো সুমন। ওর বয়স তখন প্রায় দশ। আলাদাতপুরে খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা দ্রুত পৌছানোর জন্য এই নদীর তীরের রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম। প্রায় পনের-বিশজন আমরা। আমি সবার সামনে। যেহেতু আমি দলনেতা ছিলাম, তাই সবসময়ই আমি সামনে থেকে সকলকে পরিচালনা করতাম, দিকনির্দেশনা দিতাম। তখন কিন্তু এখনকারমতো এতো জনবসতি ছিলো না। জনসংখ্যা কম ছিলো। তখন এখানে কেউ আড্ডা দিতে আসতো না, ওখানের ওই বসার জায়গাটাও ছিলো না। এখানে ছিলো বিশাল বন। তো সেদিন এই বনের ভিতর দিয়ে আমারা এগোচ্ছি। যখন ওই বটগাছটার কাছাকাছি এসেছি তখন হটাৎ কিছুটা সামনে কেমন একটা শব্দ শুনতে পেলাম, সামনে কয়েকটা ছোট ছোট বন্য

গাছ নড়ে উঠলো। যেন হাওয়ায় দুলে উঠলো সামনের ওই গাছগুলো। আমার কেমন যেন মনে হল সামনে কেউ একজন ওখানে আছে। সাথে সাথে আমি সকলকে সতর্ক করে দিলাম, আর পজিশন নিয়ে দাড়াতে বললাম। সকলেই বন্দুক বাগিয়ে পজিশন নিলো। আমি চিৎকার করে বললাম, কে? কে ওখানে? সামনে আসুন। নাহলে এখনি আপনার প্রান যাবে। কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। অপারেশন এর ভাষায় এই পদ্ধতিকে বলে হোয়াইট এইম। অর্থাৎ সম্মুখে কিছু আছে কিনা তা নিশ্চিত না হয়েও শূন্যে লক্ষ্য করে পজিশন নেওয়া।

যাইহোক আমি আবারও একবার এবং তারপর আরও একবার চিৎকার দিলাম। কিন্তু তবুও কোন সাড়া পেলাম না। তারপর একমুহূর্তের মধ্যে

সামনের ঝোপের মধ্যে থেকে কেউ একজন বিদ্যুৎ গতিতে দৌড় দিল। আমি তখনও চিৎকার করে বলছি থামুন, দৌড়াবেন না, আপনার কোন ভয় নেই, আমরা আপনার কোন ক্ষতি করবো না। কিন্তু কে শোনে কার কথা। এক দৌড়ে গিয়ে তিনি নদীতে ঝাপিয়ে পড়লেন। দেখলাম তার মুখটা গামছা দিয়ে ঢাকা, এবং হাতে একটা এসএমজি। নদীতে ঝাপিয়ে সে প্রাণপনে সাঁতরাচ্ছে। আমরা কেউই তখনো গুলি ছুড়ি নি। আমি কাউকে গুলি করার অনুমতি দেয়নি তখনো। আমি আবার চিৎকার করলাম থামুন, থেমে যান আর সাতরাবেন না। কিন্তু তিনি তবুও আমার কথা শুনলেন না, প্রাণের ভয়ে ছুটছেন তিনি, কারও কথা তখন শোনার সময় নেই। অবশেষে তিনি যখন প্রায় ওপারে পৌঁছে যাবেন তখন আমি সকলকে ফায়ার

করতে বললাম। সবাই মিলে প্রায় পনের রাউন্ড গুলি ছুড়লাম। কারটা যে লেগেছিল নাকি লাগেনি তা বোঝা যায়নি এত দুর থেকে। তারপর দেখলাম উনি কোনভাবে পানি থেকে কূলে উঠেই উবুর হয়ে পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না।

এইটুকু বলে ভদ্রলোক বড় নিশ্বাস নিলেন।আমি জিজ্ঞেস করলাম,

-তা আঙ্কেল লোকটা কে ছিলো? জানতে পেরেছিলেন? ওপারে দেখতে গেছিলেন নাকি? নাকি যাননি?

-হ্যা, জানতে পেরেছিলাম। পরে আমরা নৌকা নিয়ে ওপারে গিয়েছিলাম। দেখি দুটো গুলি খেয়ে মরেছেন, বুকে একটা আর মাথায় একটা লেগেছিল। যাইহোক আমরা তার মুখের গামছা খুলেছিলাম দেখার জন্য তিনি কে। মুখটা দেখার

পর কষ্টে আমার বুক ফেটে যেতে লাগলো, আমি কাঁদতে শুরু করেছিলাম। আবারও চোখের জল মুছলেন তিনি এবং বলতে থাকলেন। আমার দলের সবাই বলতে লাগলো, কি ব্যাপার, একজন দেশদ্রোহী রাজাকারের মৃত্যুতে আপনি কাঁদছেন কেন? তোমাদেরও মনে একই প্রশ্ন আসছে না? কেন কাঁদছিলাম? কেন কষ্ট পাচ্ছিলাম?

-আচ্ছা তুমি হলে কি কাঁদতে না? যে আমাকে এত স্নেহ করতো, কতো আদর করে মেডেল পরিয়ে দিয়েছেন তিনি, আর তিনি নাকি আমার নেতৃত্বেই মারা পড়লেন? আমার কাছেই তার মৃত্যু হলো?

আমরা কিছুই বলতে পারলাম না। মনে মনে আমাদেরও অনেক কষ্ট হতে লাগলো। হাবিব হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তা কাকু আপনার ফুটবলের

কোচ রাজাকার কেন হয়েছিলেন?

-কি জানি? আল্লাহ হয়তো ওটাই তার নিয়তে রেখেছিলেন। আমি এখনও ভাবি সেদিন যদি তিনি আমার কথা শুনতেন, যদি পালানোর চেষ্টা না করতেন, তাহলে উনাকে ওইভাবে মারা যেতে হতো না। তখন আমি বললাম, আসলে আঙ্কেল যার কপালে যা থাকে তা হতে দিতে হয়, তা আটকানোর ক্ষমতা আপনার-আমার নেই।

-হ্যা, ঠিকই বলেছো। কি জানি এইসকল কাজের জন্য আল্লাহ আমার কি শাস্তি দিবেন।

-আপনাকে কেন শাস্তি দিবেন আল্লাহ। আপনি দেশের জন্য লড়াই করেছেন, দেশের মানুষকে অন্যায়-অত্যাচারীদের থেকে রক্ষা করতে আপনি লড়াই করেছেন।

আবার দীর্ঘশ্বাস।। আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম,কিন্তু তার আগেই তিনি বললেন,

আমাকে এখন যেতে হবে। যাইহোক তোমরা এতক্ষণ ধৈর্য্য নিয়ে আমার কথা শুনলে, আমার খুব ভালো লাগছে। এতক্ষণ আগ্রহ নিয়ে আমার জীবনের গল্প শোনার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

-না না আঙ্কেল, আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ,আপনি একজন সাহসী কমান্ডার। আপনাকে স্যালুট। আপনার মত সাহসী মানুষদের কারনেই আমরা আজ এই স্বাধীন বাংলায় বাস করতে পারছি। দোয়া করবেন যেন এই স্বাধীন দেশের একজন সুনাগরিক হয়ে দেশকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারি।

-অবশ্যই, অবশ্যই দোয়া করি। তোমাদের এই কথাগুলো শুনে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যে আনন্দ হচ্ছে তা আর বলে বোঝাতে পারছি না। আল্লাহ যদি আবার কোনদিন আমাদের দেখা করায় সেদিন আরও অনেক কথা হবে।

এখনকারমতো আমি আসি। ভালো থেকো তোমরা।

-হ্যা আঙ্কেল আপনিও ভালো থাকবেন। বলে

সালাম করলাম।

উনি চলে গেলে মনে পড়ল তাড়াহুড়োয় ওনার

নামটাই জিজ্ঞেস করা হয় নি। তবে হ্যা, মনে মনে

নাম দিয়ে দিয়েছি- ক্যাপ্টেন ব্রেভ, তাছাড়া মনে

মনে অনেক গর্ববোধ হতে লাগল উনার জন্য,

এদেশের জন্য। মনে মনে অনেকটা শক্তি আসল

দেশের জন্য কিছু করতেই হবে। দেশকে বিশ্বের

বুকে সেরা তালিকায় এগিয়ে নিতে হবে।

সজীব ঘটক

প্রথম বর্ষ, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক

ইঞ্জিনিয়ারিং,

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

নিভু প্রদীপ

রাবেয়ার স্বামী নেয়ামত আলির তিন চার দিন ধরে জ্বর, কাজে যেতে পারছে না। তিনি ভ্যান গাড়ি করে ঝালমুড়ি, বুট ভাজা, চানাচুর মাখা এসব বিক্রি করতেন। ঘরে জমানো টাকা যা ছিলো তা প্রায় শেষ। রাবেয়া ভাবছে, কাল সে নিজেই ভ্যান গাড়ি নিয়ে বের হবেন।

আশার আলো সমিতির কিস্তি দেয়ার জন্য কুলসুম ভাবির থেকে পাঁচশ টাকা ধার এনেছিলো রাবেয়া। মঙ্গলবার ফেরত দেওয়ার কথা ছিলো কিন্তু দিতে পারে নাই, বলেছে শুক্রবার দিবে। আজ শুক্রবার, বসে বসে টাকা গুনতেছে। মোট ৪৫০ টাকা হলো, আরো পঞ্চাশ টাকা দরকার। বিছানার নিচে, কাপড়ের ভাঁজে, আলমারির ভেতর অনেক খুঁজেও

একটা টাকা পেলো না।

রতন জিজ্ঞেস করলো, মা তুমি কি খুঁজতেছো?

রাবেয়া বললো, সব মিলিয়ে মোট ৪৫০ টাকা হলো। আর পঞ্চাশ টাকা হলেই কুলসুম ভাবির টাকাটা দিতে পারতাম। ঔদিন টাকা দেওয়ার কথা ছিলো, দিতে পারি নাই। আজও যদি দিতে না পারি তাহলে কুলসুম ভাবির কাছে আমার মুখ থাকবে না রে।

রতন, ৫ম শ্রেণিতে পড়ে। বয়স দশ-বারো বছর হতে পারে। স্কুলের টিফিনের টাকা থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে তার বোতলের ব্যাংকে জমা রাখে।

রতন বললো, আমার কাছে কিছু টাকা আছে,

পঞ্চাশ টাকা হতে পারে, তুমি চাইলে নিতে পারো।

-তুই টাকা পাইছোস কই?

আমি জমাইছিলাম, এ বলে রতন তার বোতলের ব্যাংকটি নিয়ে আসলো। তার পর ঔটা কেটে কিছু পয়সা বের করলো, পাঁচ টাকা, দুই টাকার কয়েন।

সব মিলিয়ে পঞ্চাশ টাকার বেশি হলো।

রাবেয়া মোট পাঁচশ টাকা নিয়ে কুলসুম ভাবির বাসায় দিকে বের হয়ে গেলো, বেশি দূরে না, চার পাঁচ মিনিটের পথ।

রাবেয়া হাতটেছে আর মনে মনে ভাবতেছে, আজ তো কিছুই বাজার করা হয় নাই, ভাত রান্না করা আছে। কিন্তু কোনো তরকারি নেই। রতনকে সে কি দিয়ে ভাত দেবে? ঘরে তো আর কোনো টাকা নেই, একবার ভাবলো কুলসুম ভাবির টাকা টা আজ দেবে না, কিন্তু আজ টাকা না দিলে তাকে অনেক অপমানিত হতে হবে। হাঁটতে হাঁটতে রাবেয়া, কুলসুম ভাবির বাসায় পৌঁছে গেলো। কলিং বেল টিপতেই একটা মেয়ে দরজা খুলে দিলো। মেয়েটি এ বাসায় কাজ করে। কিন্তু চাল-চরণ, ব্যাবহার, পোশাক দেখে অন্য কেউ বুঝতেই পারবে না যে ও কাজের মেয়ে।

রাবেয়া জিজ্ঞেস করলো, কুলসুম ভাবি কোথায়?

মেয়েটি বিনয়ী ভঙ্গিতে বললো, ছোটো ভাইজান

কে ভাত খাওয়াইতেছে, আপনি ভেতরে আসুন।

কুলসুম ভাবি তার ছেলেকে ভাত খাওয়াতে ব্যস্ত। ছেলেটির বয়স সাত কিংবা আট হবে। চেহারা সুন্দর এবং মোটা হওয়ার কারণে বয়স আরো বেশি মনে হচ্ছে। এ ছেলে কে খাইয়ে দেয়ার মত কিছু নেই। কিন্তু কুলসুম ভাবি খাইয়ে দিচ্ছে। প্লেটে

ভাত, মাছ, মুরগী, ডিম সবই আছে। তার ছেলে

খেতে চাচ্ছে না, ভাবি জোর করে খাওয়াচ্ছে।

রাবেয়াকে দেখেই কুলসুম ভাবি বলল, আপনার

অপেক্ষাতেই ছিলাম। টাকা টা কি এনেছেন?

জ্বি, ভাবি। টাকা নিয়েই এসেছি।

কুলসুম ভাবি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাচঁলাম, আজ

টাকা না দিলে আমার সমস্যা হয়ে যেতো। আপনার ভাইয়ের কাছে সব টাকার হিসেব দিতে হয়। আপনাকে টাকা ধার দিছি তা জানায় নাই। যদি জানতে পারতো তাহলে আমার সাথে

রাগারাগী শুরু করে দিতো।

একটু বসেন ভাবি, ছেলেটাকে খাওয়ানো শেষ করি। ওকে নিয়ে আমার যত জ্বালা, একদম খেতেই চায় না।

-পৃথিবীর সবচেয়ে কষ্ট কি জনেন? ছেলে মেয়েদের খাবার খাওয়ানো।

-ওহ, হতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বেদনাদায়ক কি জানেন? মা হয়ে সন্তানকে খাবার দিতে না পারা।

কিছু মনে করবেন না ভাবি, একটু তাড়া আছে, আমাকে যেতে হবে। রতনের বাবা অসুস্থ। এ বলে রাবেয়া টাকাটা কুলসুম ভাবির পাশে টেবিলের উপর রেখে চলে আসলো। আসার সময় পুকুর পাড়ের কচু গাছ গুলো থেকে কিছু কচুপাতা ছিঁড়ে নিলো। এগুলো ভাজি করে খাওয়া যাবে। যদিও অনেক গলা চুলকাবে কিন্তু তাতে কি? পেট তো ভরবে।

নেয়ামত আলির জ্বর কিছুতেই কমছে না, ফার্মেসী থেকে প্যারাসিটামল এনে খাইয়েছিলো, ওষুধ খেলে জ্বর একটু কমে কিন্তু পুরোপুরি কমে না। খাবার দাবার কিছুই খেতে পারে না। শরীরের অবস্থা এমন হয়েছে যে, দেখলে মনে হয় ৭০ বছরের বুড়ো।

সকাল ১০ টা দিকে রাবেয়া, নেয়ামত আলিকে জোর করে অল্প একটু ভাত খাইয়ে দিলো। তার পর ওষুধ খাইয়ে দিলো। রতন কে বললো, বাবার কাছে থাকতে। মাঝে মাঝে মাথায় পানি দিয়ে দিতে।

রাবেয়া ভ্যান গাড়িতে মুড়ি চানাচুর সব কিছু গুছিয়ে নিচ্ছে। ভ্যান গাড়ি নিয়ে বের হবে।

নেয়ামত আলি ডেকে বলে,

-রাবেয়া কি করছো?

-কিছু না একটু গাড়ি টা নিয়ে বের হবো।

-কি বলো, তুমি পারবে না।

-না পারি চেষ্টা তো করতে পারি, ঘরে বসে থাকলে তো কেউ টাকা দিয়ে যাবে না।

-আচ্ছা, রতন কে সাথে নিয়ে যাও।

-না, তুমি অসুস্থ, তোমাকে একা রেখে যাবো না।

-আমার সমস্যা নেই, এখন একটু ভালো লাগতেছে, তুমি রতন কে নিয়ে যাও।

রাবেয়া রতন কে নিয়ে বের হয়ে গেলো। রাবেয়া ভ্যানের হাতল ধরেছে, রতন পিছন থেকে গাড়িটা ঠেলতেছে। বাজারে এক পাশে তারা ভ্যান রেখে, সামনে কাস্টমার বসার জন্য ৩ টা টুল সাজিয়ে দিলো। কাস্টমার আসলে রাবেয়া ঝালমুড়ি বানিয়ে দিচ্ছে আর রতন সেগুলো কাস্টমারের কাছে দিয়ে আসে, আর টাকা নেয়। দুপুর পর্যন্ত তাদের বেচাকেনা ভালোই হলো। বাসায় ফিরে আসার সময় তারা বাজার থেকে কিছু কাঁচা বাজার করে আনলো রান্না করার জন্য। নেয়ামত আলির জ্বর বেড়েছে, শরীরে হাত দেয়া যায় না, আগুনের মতো গরম। রাবেয়া তাকে ভেজা গামছা দিয়ে পুরো

শরীর মুছিয়ে দিতে দিতে বললো,

-চলো তোমায় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।

নেয়ামত আলি অবহেলার ভঙ্গিতে বললো,

-ডাক্তার কি করবো? সেই তো নাপা ওষুধ ই দিবো। জ্বরের জন্য নাপা খায় তা সবাই জানে। তার আগে বলো তোমার বেচাকেনা কেমন হলো? কোনো সমস্যা হয় নাই তো?

-নাহ, বেচাকেনা আলহামদুলিল্লাহ, ভালোই হইছে।

-ও আচ্ছা, বিকেল বেলা বেশি বেচাকেনা হয়। তখন সবাই ঘুরতে বের হয়। বাজার করেছো কি?

-১ কেজি পেপে আর লাল শাঁক।

-ওহ, অল্প করে চিংড়ি মাছ আনতে, পেপে দিয়া চিংড়ি মাছের তরকারি অনেক ভালো লাগে।

-আচ্ছা, বিকালে বের হলে নিয়া আসবো, তারপর রাতে পেপে দিয়ে চিংড়ি মাছ রান্না করবো, এখন আমি লাল শাক ভাজি করি। তুমি শুয়ে থাকো।

রতন কে বলবো মাথায় পানি দিয়ে দিতে।

রাবেয়া, নেয়ামত আলির কপালে ভেজা কাপড় দিয়ে রান্না ঘরে চলে গেলো।

বিকাল ৪ টার দিকে রাবেয়া ভ্যান গাড়ি নিয়ে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, নেয়ামত আলির জ্বর অনেকটা কমে গেছে, বিছানায় বসে রতনের সাথে কথা বলতেছে। রতনকে শিখিয়ে দিচ্ছে কিভাবে ঝালমুড়ি বানালে বেশি টেস্ট হয়। রতন, নেয়ামত আলির থেকে ঝালমুড়ি বানানো সব কৌশল শিখে ফেলেছে। রাবেয়া যখন বের হবে তখন নেয়ামত আলি ডেকে বললো,

-আজ আর বের হওয়ার দরকার নেই আবার কাল যেও।

রাবেয়া বললো,-এইতো সন্ধার আগেই চলে আসবো। তুমি একটু ঘুমানোর চেষ্টা করো।

রতন কে নিয়ে রাবেয়া চলে গেলো। এই দিকে

নেয়ামত আলির জ্বর প্রচন্ড বেড়ে গেছে। কখনো হুশ হয় কখনো বেহুশ। সন্ধ্যার সময় রাবেয়া আর রতন আধা কেজি চিংড়ি মাছ নিয়ে বাসায় ফিরলো। দরজা খুলতেই নেয়ামত আলিকে দেখলো ঘরের মেঝেতে উপুর হয়ে পড়ে আছে। রাবেয়া তারাতাড়ি ছুটে গিয়ে নেয়ামত আলিকে কোলে নিয়ে ডাকা ডাকি করতে লাগলো কিন্তু কোনো সাড়া নেই, আগুনের মতো গরম শরীর টা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে আছে। রতন, বাবা,বাবা করে ডেকে যাচ্ছে কিন্তু কোনো উত্তর নেই। নিথর দেহটা রাবেয়ার কোলে পড়ে আছে।

রাইহান

শিক্ষাবর্ষঃ২০১৯-২০

ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সমাপ্ত